সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা এবং জরুরী জ্ঞাতব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

আহলুল হাদীস ও আহলুর রা’য় এর মাঝে মতভেদের কারণ (أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي)

জেনে রাখুন! তাবেঈ ও তার পরবর্তী যুগের একদল আলিম রায়ের মাঝে ডুবে থাকাকে অপছন্দ করতেন এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাৎওয়া প্রদান ও মাসআলা উদ্ভাবন করাকে ভয় পেতেন। হাদীস বর্ণনা করাই ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে হাদীস ও আসার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজটি প্রসারতা লাভ করে। বিভিন্ন পুসিত্মকা ও পা-ুলিপি লেখালেখির কাজ শুরু হয়। অতঃপর তারা তৎকালীন সময়ের বড় বড় বিদ্বানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইয়ামান ও খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে হাদীসগুলোকে গ্রন্থে একত্র করেন ও বিভিন্ন পা-ুলিপির অনুকরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যান। ফলে তাদের কাছে এতো হাদীস ও আসার একত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয় নি। প্রত্যেক অঞ্চলের ফক্বীহ সাহাবী ও তাবেঈদের যে আসারসমূহ মুফতীদের কাছে গোপন হয়েছিল এ সময়ে তাদের কাছে তা একত্রিত হয়ে যায়। এর পূর্বে কারও পক্ষে নিজ অঞ্চল ও স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের হাদীস সংকলন ছাড়া দূরবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়ে হাদীস সংকলন করা সম্ভব হয় নি। এ সময়ে গ্রন্থায়ন, আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে হাদীসের সনদগত অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে।

অতঃপর বর্ণনা শাস্ত্রের বিধান তৈরি ও হাদীস জানার পর সে সময়ের মুহাক্কিকগণ ফিক্বহের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাদের কাছে পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের উপর ঐকমত্য পোষণ করা হবে এমন কোন রায়ের অস্তিত্ব ছিল না, যদিও প্রত্যেকটি মাযহাবের নীতিমালা বিরোধী হাদীস ও আসার লক্ষ করা যেত। এ যুগে ও এর পূর্ববর্তী যুগে যে সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের সমালোচনা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তারা মারফূ, মুত্তাসিল, মুরসাল অথবা মাওকূফ হাদীসর মধ্যে যে কোন একটি হাদীস পেয়েছেন কিংবা শাইখাইন, সমস্ত খলীফা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহ ও কাজীদের আসার সমূহের মধ্যে কোন আসার পেয়েছেন। ফলে এভাবেই আল্লাহ্ তাদের জন্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, হাদীসের রেওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, হাদীসের সত্মর জানার ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত ও ফিক্বহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ)। এরপর ইসহাক বিন রাহওয়াই (রাহিমাহুল্লাহ)। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলেন: ‘‘আপনারা আমাদের চেয়ে সহীহ খবরের ব্যাপারে বেশি অবগত। সুতরাং কোন সহীহ খবর পেলে আমাকে জানাবেন। কুফা, বসরা অথবা সিরিয়ার যে কোন অঞ্চলই হোক না কেন আমি সেখানে গিয়ে তা সংগ্রহ করব’’।

এদের উত্তরসূরী হিসেবে একটি দল মনে করল যে, তাদের পূর্ব অনুসারীগণ যথেষ্ট পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ ও সরবরাহ করেছেন এবং এর মূলনীতির উপর ফিক্বহ শাস্ত্র রচনা করেছেন। ফলে তারা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। যেমন:

ইয়াযিদ বিন হারুন, ইয়াইয়া আল কাত্তান, আহমাদ ও ইসহাকসহ আরও যে সমস্ত হাদীস বিশারদ যে হাদীসগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তা বাছাই করার কাজ।
বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ফক্বীহ এবং বিদ্বানগণ যে ফিক্বহ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে মাযহাব রচনা করেছেন, সে সমস্ত হাদীসগুলো একত্রিত করার কাজ।
প্রত্যেক হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ এবং প্রত্যেক এমন হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ যে হাদীসগুলো পূর্ব যুগ থেকেই ব্যাখ্যা করা হয় নি, এর মধ্যে শা’য ও ফা’য এর মত বিরল বর্ণনার হাদীসও রয়েছে।

এ সব মহৎ কাজগুলো এ যুগের বিদ্বানগণ সম্পূর্ণ করেন। এক্ষেত্রে যারা বড় অবদান রেখেছেন তারা হলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আবদ বিন হুমাইদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ, আবূ ই’য়ালা, তিরমিযী, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, হাকেম ও বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) সহ আরও অনেকেই।

অন্যদিকে এদের বিপরীতে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ), সুফইয়ান ও তাদের পরবর্তীদের যুগে এমন একটি দলকে দেখা গেছে, যারা মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করাকে অপছন্দ করতেন না এবং ফাৎওয়া প্রদান করতে ভয় পেতেন না। বরং তারা হাদীস বর্ণনা করতে ও তা রাসূল (ﷺ) এর দিকে সম্বোধন করতে ভয় পেতেন। এমন কি শা’বী বলেন: ‘‘যিনি রাসূল (ﷺ) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন, তিনি আমাদের কাছে খুবই প্রিয় ব্যক্তি। তবে কেউ রাসূল (ﷺ) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কম-বেশি করলে, তার দায়ভার সে নিজেই বহন করবে’’।

ফলে তাদের প্রয়োজনে হাদীস, ফিক্বহ ও মাসআলা-মাসায়েল লিপিবদ্ধের কাজ শুরু হয়। তার কারণ হল, তাদের কাছে তেমন কোন হাদীস ও আসার ছিল না, যার দ্বারা তারা হাদীস বিশারদদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ফিক্বহী মাসআলা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে। সে সময় বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্বানদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য, মতামতগুলো সংকলন ও সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তাদের অন্তর সুপ্রসন্ন হয় নি। এ ব্যাপারে তারা নিজেদেরকেই দায়ী করেন। তারা তাদের ইমামদেরকে এমন বিশ্বাস করতেন যে, তারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। তাদের অন্তর তাদের অনুসারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ‘‘ইবরাহীম নাখঈ সালিমের চাইতে ফিক্বহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ। যদি সাহাবাদের মর্যাদা বেশি না হত তাহলে আমি বলতাম যে, ইবনে উমার (রাঃ) এর চাইতে আলকামাহ ফিক্বহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ’’।

তাদের ছিল তীক্ষ্ম মেধা শক্তি, সচেতন যুক্তি-তর্ক ও দ্রুত এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার জ্ঞান, যার মাধ্যমে তারা তাদের অনুসারীদের মতামতের বিবিধ মাসআলার জওয়াব উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতেন। ফলে তারা ব্যাখ্যার নিয়মানুসারে ফিক্বহ শাস্ত্র রচনা করেন। এভাবে বিভিন্ন মাযহাবের ব্যাখ্যার কার্যক্রম চালু হয়ে তা ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক মাযহারের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন, তাদের কাছে বিভিন্ন বিচার-ফায়সালা ও ফাৎওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হত। ফলে তাদের গ্রন্থগুলো জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় মাদরাসাতুল হাদীস ও মাদরাসাতুল ফিক্বহ নামে দু’ধরণের মাদরাসার সূচনা হয়। এ দু’টিকে (হাদীস ও ফিক্বহ) লক্ষ্য করে আল্লামা খত্ত্বাবী ‘মা’আলিমুস সুনেই’ গ্রন্থ রচনা করে বলেন:[1]

“আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দু’টি বিষয় অর্জন করেছে এবং দু’টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

১. হাদীস ও আসার এর অনুসারী।

২. ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) অনুসারী।

তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। কেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে ফিক্বহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা। স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দু’টি বাড়ীর মত। প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে আসে। তাদের উভয়কেই তার সাথীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে দরকার হয়। তারা যেন হিজরতকারী ভাইয়ের মতো। কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রেওয়ায়াত বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একত্রিতকারী, গরীব ও শা’য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই জাল অথবা মাকলূব বা পরিবর্তিত। তারা হাদীসের মূল ভাষ্যের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং এর গোপন ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফক্বীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাঁকা চোখে দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফক্বীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ।

অপরদিকে যারা ফিক্বহ ও নাযর (যুক্তি) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন হাদীস বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না। উত্তম হাদীসকে নিম্নমানের হাদীস থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌঁছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে হয়ে গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে সেই যঈফ ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে। এভাবে ক্রমাগতভাবে কোন নির্ভরযোগ্যতা ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে রাবীর বর্ণনা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

এদের মধ্যে একটি দল ছিল, (আল্লাহ্ তাদের তাওফীক্ব দান করুন) যদি তাদের কাছে তাদের মাযহাবের বিদ্বানগণ ও তাদের দলনেতারা নিজের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করে কোন কথা বর্ণনা করেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টা তালাশ করেন এবং তারা কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার চাইতেন না। ফলে আমি ইমাম মালিকের অনুসারীদের পেয়েছি যে, তারা তাদের মাযহাবের মধ্যে ইবনে কাসিম, আশহাব ও তাদের উভয়ের মত মহৎ ব্যক্তিদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। যদি আবদুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম ও তার সমপর্যায়ের বর্ণনা তাদের কাছে আসত তাহলে সেটাকে তারা তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে হতে আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ বিন হাসান, আলিয়্যাহ এবং তার (আবূ হানীফার) গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের বর্ণনা ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। যদি

তাদের কাছে হাসান বিন যিয়াদ আল্লু’লু এবং তার মত বর্ণনাকারীদের কোন মতামত আসত, যা ইমাম আবূ হানীফার মতের বিরোধী তাহলে তারা তা গ্রহণও করতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না। অনুরূপভাবে আপনি ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা তার মাযহাবের মধ্যে মাযিনী, রাবীঈ বিন সুলাইমান আল মারাদী এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন। যদি তাদের কাছে খুযায়মাহ, জারমী এবং তাদের মত বিদ্বানের কোন বর্ণনা আসে, তাহলে তার দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করতেন না এবং এটাকে তার (শাফেঈর) মতামত বলে গণ্য করতেন না। এভাবে ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকটি মাযহাবের ইমাম ও উস্তাদের গোঁড়ামীর অভ্যাস ছিল। তাদের অবস্থা যদি এ রূপই হয় যে তারা শাখাগত মাসআলা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাইখদের ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে কিভাবে তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করা সহজ হবে? আর কিভাবে তারা সকল ইমামের ইমাম ও মহান প্রভুর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রেওয়ায়াত ও বর্ণনার প্রতি ভরসা রাখবে? অথচ রাসূল (ﷺ) এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক, তাঁর হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। এমনকি তিনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না এবং তাঁর সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না। ভেবে দেখেছেন কি যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে প্রতিপক্ষের প্রতি উদার হয়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধ টাকা বা সম্পদ গ্রহণ করে এবং এর প্রতিদানে তাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে। সুতরাং অন্যের পক্ষে যখন সে প্রতিনিধিত্ব করবে তখন কি তার অধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ করা বৈধ হবে? যেমন দুর্বলের প্রতিনিধিত্ব করা, ইয়াতিমের অভিভাবক হওয়া এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির উকিল হওয়া! এরূপ করলে সে ওয়াদার খিয়ানতকারী ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতাকারী ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে বিবেচিত হবে কি? এই দৃষ্টান্তটি বাসত্মবে হতে পারে কিংবা নিছক উদাহরণ হতে পারে।

কিন্তু কিছু সংখ্যক দল রয়েছে যারা সত্যের পথকে কঠিন মনে করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা সহনশীলতা দেখানোকে ভাল মনে করেছে। এরা দ্রুত প্রাপ্তিকে পছন্দ করেছে। ফলে তারা জ্ঞানের পথকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। সামান্য জ্ঞানের উপর তারা সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং উসূলে ফিক্বহ এর পরিভাষাগত সামান্য কিছু শব্দের উপর অনড় থেকেছে যেগুলোকে তারা ‘ইলাল’ বা কারণ হিসেবে নামকরণ করে থাকে। এ গুলোকেই তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য মডেল বানিয়ে নিয়েছে। এটাকে তারা নিজেদের বিবাদের সময় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এটাকে অনর্থক কথা ও ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। এর দ্বারা তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এর উপর ভিত্তি করে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এ বিবাদের সমাধানের জন্য যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান দিয়ে থাকেন। ফলে তিনি ঐ যুগের একজন উল্লেখযোগ্য ফক্বীহ হিসেবে অভিহিত হন। তার দেশে ও শহরে তিনি সম্মানিত একজন নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এ দলটিকে শয়তান সুক্ষ্ম কৌশলে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং নিপুণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। শয়তান তাদের বলে, তোমাদের কাছে যা আছে তা তো সংক্ষিপ্ত জ্ঞান, এটা নগণ্য পণ্যের মতো, এর দ্বারা প্রয়োজন ও পরিপূর্ণতায় পৌঁছা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন কথার সাহায্য নাও, এর সাথে বিচ্ছিন্ন কথা

মিলিয়ে দাও এবং বিদ্বানদের নীতিমালার সহযোগিতা নাও; যাতে কোন ব্যক্তির মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই ইবলিস তাদের প্রতি তার ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে এবং তাদের অনেকেই তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে। তবে মু’মিনদের একটি দল ইবলিসের অনুসরণ করে নি। সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তিবর্গের জন্য পরিতাপ! শয়তান তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের লক্ষ্যস্থল ও সঠিক পথ থেকে ধোঁকা দিয়ে কোন দিকে পথ দেখাচ্ছে? আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করুন। ইমাম খত্ত্বাবীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্তি এখানে শেষ হল।

ফুটনোট

[1] আল্লামা খত্ত্বাবী প্রণীত‘মা‘আলিমুস সুনান’ (১/৭৫-৭৬) ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2196

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন